'পদিপিসির বর্মিবাক্স': ঘোর বাস্তব এক আখ্যান

সুমিতা মুখোপাধ্যায়

মা বিরক্ত হতেন, উৎসাহী চার-পাঁচটি সহৃদয় শ্রোতা জুটিয়ে ছোট্ট লীলা যখন মনগড়া গল্প বলায় ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল। মা মনে করতেন সেজন্যে এক ধরনের মিথ্যাচার। কিন্তু বালিকা কন্যা প্রাণপণে 'তথাগত সত্যি' আর 'গাঁজার গাঁজা' — আকাশ-পাতাল ফারাকটা মা-কে বোঝানোর চেষ্টা করত। কিন্তু মায়ের অকাট্য যুক্তি "তাহলে আগেই বলে দিস গল্পটা মিথ্যা"।

এইভাবে বাস্তব আর কল্পনার রেষারেষিতেই লীলার বারো থেকে তেরোয় পা। কিশোরী লীলা একের পর এক রোমাঞ্চকর সব গল্প মনে মনে তৈরি করে আর সেইসব গল্প মুখে মুখে বলে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে ছোটো বোনটিকে। তার আরো বাড়তি পাওনা লীলার হাতে আঁকা ছবি।

—"শ্রোতা যেখানে উদ্‌গ্রীব, উৎসাহী, আহ্লাদে ভরপুর, গল্প সেখানে আপনি ডানা বাঁধে। আমার তেরো বছরে একটি গল্প হল পদিপিসির বর্মিবাক্স.....এ গল্প তখনি লেখা হয় নি।"

তখন কোনো গল্পই লেখা হত না। বুদ্‌বুদের মতো মনে জেগে উঠলেই সেগুলোতে রঙ চড়িয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে বলে ফেলতে হত। ব্যাস। গল্পকার থেকে শ্রোতা, এক হৃদয় থেকে আরেক হৃদয়ে সরাসরি ট্রান্সমিটেড হয়ে যেত সেই গল্পরসের অমলিন ধারা। লেখিকার অনুভবে এ বোধ বদ্ধমূল,—"বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে পড়ুয়ার দৃষ্টিপথে গল্পের শোভাযাত্রা হয় না, হয় মন থেকে মনে।"

আসলে অবিরতই তাঁর মনে গল্পরা সব তৈরি হতে থাকত যে; 'পদিপিসির বর্মিবাক্স' গল্প তৈরির পেছনের গল্পটা ছিল এমনই। তেরো বছর বয়সের সেই রহস্যরোমাঞ্চ প্রায় সাতাশ বছর পর ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পেয়েছিল কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ছোটোদের পত্রিকা 'রংমশাল'-এ।

'বর্মিবাক্স'—যত রহস্য একে ঘিরে। তার একশো বছরের পুরোনো সে বাক্স। তাতে রয়েছে পান্না-হীরে-চুনী খচিত নানা মূল্যবান অলংকার। গল্পে পাঁচুমামাই সেই দুর্মূল্য বাক্সের সঙ্গে পাঠক ও গল্পের কিশোর চরিত্রকে পরিচয় করিয়ে দেয় এইভাবে:

"খুড়ো সিন্দুক খুলতেই হীরে-জহরতের আলোয় পদিপিসির চোখ ঝলসে গেল। খুড়ো ভেবেছিলেন সেই সঙ্গে পদিপিসির মাথাটাও ঘুরে যাবে, কী নেবে না নেবে কিছু ঠাহর করতে পারবে না। কিন্তু পদিপিসি সে মেয়েই নয়। তিনি অবাক হয়ে গালে আঙুল দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'ওমা, এ যে আলাদিনের ভাঁড়ারঘর! ব্যাটা ঠ্যাঙাড়ে বাটপাড়, কী দাঁওটাই মেরেছিস।' বলে দু হাত জড়ো করে এক টিপি ধনরত্ন মাটিতে নামালেন। আর একটা হাঙরের নক্‌শা-আঁকা লাল বর্মিবাক্সও টেনে নামালেন।"

বর্মিবাক্স, নামটার সঙ্গে কেমনতরো বর্মাদেশের গন্ধ যেন। হাঙরের নক্‌শা-কাটা

বাক্সটার সঙ্গে তাহলে কি প্রতিবেশী দেশটার কোনো যোগসূত্র রয়েছে, নইলে বর্মিবাক্স কেন? গল্পে এর বর্ণনা শুনে মনে হয় বিশেষ কৌশলে নির্মিত এটা এক ধরনের বাক্স। হতেই পারে সে দেশের 'গয়নার বাক্স'! খুড়োর যা পেশা তাতে করে এও হয়তো কোন ডাকাতির ধন। বাক্স-ভর্তি পান্না-হীরে-চুনী! বার্মিজ রুবি। জগত-জোড়া নাম। এক সময় ব্রহ্মদেশ থেকে সব দামি দামি রত্ন বিদেশের বাজারে রপ্তানিও হত। স্বয়ং পদিপিসি স্বপ্নে গল্পের কিশোর চরিত্রকে জানিয়ে দিয়েছেন, বর্মিবাক্সে একজোড়া চুনীর কানের দুলের অস্তিত্ব। সুতরাং বর্মিবাক্স আর রত্নভাণ্ডার— একেবারে দুয়ো-দুয়ে চার। বাক্সটার সঙ্গে বর্মার যোগসাজশ প্রায় প্রমাণিত। কিন্তু গণ্ডগোলটা বাধে বাক্সের ওপরের নক্‌শা নিয়ে। পাঁচু মামার বয়ানে সে ছবি হাঙরের, ওদিকে কিশোরটি রাতভর দেখে গেল, ওটা একটা ড্রাগন!

—"আমার চোখের সামনে খালি দেখতে লাগলাম বড় সাইজের একটা বর্মিবাক্স, লালচে রঙের উপর কালো দিয়ে আঁকা বিকট হিংস্র এক মাছ প্যাটার্নের ড্রাগন, তার চোখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে, নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, জিভ লকলক করছে।"

দুজনের কাছ থেকে দুরকম বর্ণনা পাওয়া গেল। একজন জানে ওটা হাঙর, আর একজনের কল্পনায়, ওটা ড্রাগন। বর্মি সংস্কৃতিতে ড্রাগন মিথিক্যাল একটা চরিত্র, যে কিনা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বর্মিবাক্সের ওপর ড্রাগনের প্যাটার্ন থাকার সম্ভাবনাই ষোলআনা। তাই খুব যুক্তিসঙ্গতভাবেই বর্মিবাক্সের সঙ্গে ড্রাগনের নক্‌শা কিশোর কল্পনায় ধরা পড়েছে। ওদিকে পাঁচুমামা বলছে হাঙর, সে আজ অবধি এমনটাই শুনে এসেছে যে! পিসির বর্মিবাক্স পাওয়া ও হারিয়ে যাওয়া ইস্তক গোটা গল্পটার পটভূমি শহর কলকাতা ছাড়িয়ে দূরের কোনো মফস্বল শহরে, যেখানে পাঁচুমামার জ্যাঠা-খুড়োরা হাঙর চেনে, ড্রাগন নয়। ড্রাগনের ধারণা মূলত বহিরাগত বর্মিসংস্কৃতি সঞ্জাত। সে কারণে সোজকরি বাক্সের ওপর ঐ জাতীয় পশুকে হাঙর হিসেবেই চিনে নিয়েছে তারা। পাঁচুমামার বিবরণে শেষমেশ তাই ওটা হাঙরই হয়ে থাকে।

তা সে হাঙরই হোক বা মাছ প্যাটার্নের ড্রাগনই হোক বাক্সটা আদতে পদিপিসির। এটাই সত্যি। যার কিনা ইয়া ছাতি, ইয়া পাঞ্জা, যিনি কিনা রোজ সকালে আধসের দুধের সঙ্গে একপোয়া ভেজানো ছোলা খেতেন। যার ক্রুদ্ধ চাউনিতে নাকি গামলা গোক পাকা তিনদিন দুধের বদলে দই দিয়েছে। তবে এর সত্যমিথ্যে জানা নেই, শোনা কথা। কিন্তু লেখিকার বয়ানে, "কল্পনা যতই উদ্ভট হোক, তার গোড়া খুঁড়লে একটা বাস্তব শিকড় খুঁজে পাওয়া যায়।"

১৯৮১ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লীলা মজুমদার জানিয়েছিলেন কল্পনার উদ্ভটত্ব থাকলেও তার পা দুখানি কোথাও না কোথাও আটকে থাকে বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে। তাই তাঁর লেখা যতই কল্পনা-নির্ভর হোক না কেন তা

Scanned with CamScanner

কখনই বাস্তব-বিমুখ নয়। আসলে জলের গুঁড়ি দিয়ে মেঘ, তাতে রামধনুর সাত রঙ, ঝাউগাছে আস্ত ফুটবলের মতো বোলতার চাক, লাল-কালো মাকড়সা, রাগী শুঁয়োপোকার ঝোঁস্‌ফোসানি, গাছের গায়ে ছাতার মতো ব্যাঙের ছাতার গজিয়ে ওঠা এসবই তো চর্মচক্ষু দিয়ে তাঁর দেখা, ঘোর বাস্তব বৈকি?

—"এই সব সত্যিকার জিনিস দিয়ে গল্প তৈরি হয়।"

হয়তো লেখিকার দেখা এমনই কোনো ব্যক্তিত্ব পদিপিসির চরিত্র নির্মাণ কল্পনাকে উস্কে দিয়েছিল, আদপে সে ছিল অকর্মণ্য কোনো পুত্রের স্নেহশীলা মা। গল্পে পদিপিসির মাতৃহৃদয়ের স্নেহ নামক প্রবৃত্তির এক বাস্তব প্রবণতাকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে কল্পনার উদ্ভটত্ব আর রোমাঞ্চকর লোমহর্ষক কিছু সিচ্যুয়েশন। সেই সব মুহূর্তগুলোর নিয়ন্ত্রক কেবলমাত্র পদিপিসি-ই। পিসির পরিচয়-পর্বে পাঁচুমামার উচ্চকিত ঘোষণা : "পদিপিসির নাম ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লেখা থাকতে পারত তা জানিস?"

কিন্তু কীভাবে?

"একবার ঘাস দিয়ে এইসা চচ্চড়ি রেঁধেছিলেন যে বড়লাট সাহেব একেবারে থ! বলেছিলেন, এই খেয়েই তোমলোককো দেশকো এইসা দশা। থাক গে সেকথা! অদ্ভুত রাঁধুনি ছিলেন পদিপিসি।"

পিসির রান্না প্রসঙ্গে বড়লাট সাহেবের দেশ সম্পর্কিত ব্যঙ্গোক্তি অমলিন হাস্যরসে বিধৌত হলেও বাস্তবটা কোথাও কাঁটার মতো বেঁধে। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে, তেমনই পাক্কা এই রাঁধুনিটি-ই আবার বত্রিশ বিঘার শালবনে সিংহের তেজ নিয়ে ডাকাতদের মুখোমুখি হয়ে তাদের নির্দেশ দেন, "এবার তোরাই আমাকে নিমাইখুড়োর বাড়ি কাঁধে করে পৌঁছে দে!"

কিন্তু অমিতবিক্রমশালিনী পিসির চেহারা দেখো! বেঁটেখাটো বিধবা মানুষ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পাঁচজনের সংসারে এই ধরনের পিসিদের তো দেখাই যায়!

—"আর মনে জিলিপির প্যাঁচ!" ঘাসচচ্চড়ি রান্নার অদ্ভুতত্বের সঙ্গে অবলীলায় লীলা মিশিয়ে দেন 'জিলিপির প্যাঁচ'-কে। কল্পনা আর বাস্তবের অসাধারণ ব্লেন্ডিং।

পদিপিসি বুদ্ধিমতী। নিমাইখুড়োর জঙ্গলে একা থাকার মধ্যে তিনি রহস্যের গন্ধ পান। খুড়োর সঙ্গে তার মেলা চেলাচামুন্ডা, মুখে ভগবানের নামগান, অথচ অফুরান টাকার যোগান ও দান ধ্যান! এ যে সৎপথে উপার্জিত ধন নয়, সে কথা পিসি বুঝতে পারলেও ব্যক্তিগত অনুমানকে গোপন করে গোয়েন্দাসুলভ চাতুর্যে বত্রিশ বিঘে শালবন পেরিয়ে পাড়ি দিয়েছেন খুড়োর বাড়ি। পথে ডাকাতদলের মোকাবিলায় পিসি মোক্ষম চালটি চাললেন এই বলে যে, তিনি নিমাইখুড়োর আত্মীয়। সুতরাং তাকে খুড়োর বাড়ি পৌঁছে দেবার দায়িত্বও তাদের। এই চালেই কেল্লাফতে। ডাকাতদের কাকুতিমিনতি দেখে পিসি মহা খুশি, তাঁর অনুমান মিথ্যে নয়, খুড়ো-ই ডাকাতদলের সর্দার। এরপরই পদিপিসি খুড়োর অফুরান ধনভাণ্ডারের উৎস যে ডাকাতি-ই এই সত্যকে কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই পদিপিসি গজার মা।

"পায়ের বুড়ো আঙুলে হোঁচট লেগেছে, আর তা ছাড়া মনেও খুব একটা ধাক্কা লেগেছে। এর কী প্রতিশোধ নেব এখনও ঠিক করিনি। এখন রান্না করব, খাব, তারপর পান মুখে দিয়ে শুয়ে শুয়ে ভেবে দেখব।"

পিসি মনেও একটা ধাক্কা পেয়েছে, খুড়োকে ভয় দেখাতে এটাই যথেষ্ট, পাশাপাশি প্রতিশোধ নেবার প্রসঙ্গ তুলে পিসি খুড়োকে জানিয়ে দেয় সত্যিটা তার অজানা নয়। ভয়ে খুড়োর মুখ যতই ফ্যাকাশে হতে থাকে পিসি ততই জাঁকিয়ে বসে। নিষ্পত্তির জন্য শুরু হয় দরকষাকষি। পাঁচশো টাকা থেকে পাঁচ হাজার! সত্য প্রকাশে নাছোড় পিসির মুখ বন্ধ করতে মরিয়া খুড়ো অবশেষে ধনরত্ন ভরা সিন্দুক খুলে দিলেন। অজানাদিনের ভাঁড়ারঘর থেকে দুহাত জড়ো করে এক ঢিপি ধনরত্ন তুলে পিসি হাত বাড়ালেন বর্মিবাক্সের দিকে। খুড়োর আপত্তিতে সরাসরি তিনি জানিয়ে দিলেন,— "চোপরাও শালা। নয়তো সব প্রাইভেট ব্যাপার খবরের কাগজে ছেপে দেব।"

এ যে একেবারে ব্ল্যাকমেলিং! কিন্তু কেন? আচরণের পেছনে একটাই কারণ তিনি গজার 'মা'।

পদিপিসির এক ছেলে আছে। তার নাম গজা। লাটসাহেব ভারি। গাঁজাখোর জুয়াড়ি সেই ছেলের প্রতি পিসির অপার স্নেহ, "পদিপিসি যেখান থেকে যেমন করে পারেন টাকা জোগান। পাজি ছেলেকে পায় কে?"

এবার বোধকরি অনুমানের ওপর ভর করে পদিপিসির খুড়োর বাড়ি উজিয়ে আসার কারণটা পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তবে কি বর্মিবাক্স-ভর্তি গয়না গজাকে দিল তার মা? গল্পের ক্লাইম্যাক্সে তো তেমন কোনো সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। পিসি তো মনেই করতে পারছে না, বাক্সটা কোথায় গেল? কাকে দিয়েছেন বাক্সের জিম্মা? এইভাবেই লেখিকা জিইয়ে রাখতে সক্ষম হন গল্পের রোমাঞ্চকর নাটকীয়তা। বাক্সের শোকে অর্ধেক পিসি স্বর্গে যাবার একটু আগে ফিক্ করে হেসে জানালেন:

'এই রে! বাক্সটা কী করেছিলাম এদ্দিন পরে মনে পড়েছে!' বলেই চোখ বুজলেন।"

নিদারুণ ফিচ্‌লেমি বললেও কম বলা হয়। অসাধারণ কৌতুকরসের আধার যেন লীলা মজুমদার। মৃত্যুর মতো এমন নিষ্ঠুর সত্যকেও যে কত সূক্ষ্মসরসভাবে পরিবেশন করা যায় তার এক বিচিত্র নিদর্শন। মৃত্যুর আগে ফিক্ করে হাসি, মনে পড়া ও মনে পড়ার আকস্মিকতাকে 'এই রে!' বলে যে ভাবে পিসি চোখ বুজলেন, এই সবটুকু মিলিয়েই চূড়ান্ত একটা ইয়ার্কির পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়। অথচ এখনো অবধি সেই বর্মিবাক্স। আচ্ছা, পিসি কি ইচ্ছে করেই ভুলে ছিলেন? নাকি সত্যিসত্যিই তাঁর মনেই ছিল না? না, পদিপিসি ইচ্ছে করে ভুলে যাবেন তেমন মানুষ তো তিনি নন। এই ধরনের মিথ্যাচার তাঁর চরিত্র-বিরুদ্ধ। গজার দিনলিপিতেই লেখা আছে:

"সোমবার।। সর্বনাশ হইয়াছে! মাতাঠাকুরানির গোরুর গাড়ি উঠানে প্রবেশ করিতেই আগে নামিয়া আমার হাতে বর্মিবাক্স গুঁজিয়া দিয়া মাতাঠাকুরানি সমস্ত ভুলিয়া

Scanned with CamScanner

গিয়াছেন ও অভ্যাস মতন বাড়িসুদ্ধ সকলকে তাড়নপীড়ন করিতেছেন।"

অর্থাৎ ভুলে যাওয়াই পদিপিসির স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। অকর্মণ্য ছেলের ভবিষ্যৎ বিঘ্নহীন মসৃণ করে তোলার অদম্য তাড়ন থেকেই পদিপিসি খুড়োকে ব্ল্যাকমেইল করে গয়না সমেত বর্মিবাক্স নিজের কুক্ষিগত করতে চেয়েছেন। বাড়ি ফিরে সে সম্পদ গজার হাতে তুলে দিয়ে তবেই না পিসি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন। গল্পের নাটকীয় মোচড়টা বুঝি এইখানেই, যেখানে পিসি বেমালুম ভুলে গেলেন ব্যাপারটা। বর্মিবাক্স ভ্যানিস! এরপর বাক্স ফিরে পাওয়া সে আরেক রহস্যরোমাঞ্চ, বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা।

কিন্তু 'অদ্ভুত রাঁধুনি' পদিপিসির যতই থিয়েরে তেজ, পালোয়ানি বুকের ছাতি আর পাল্লা থাকুক না কেন আদপে তিনি গজার 'মা'। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে'—মাতৃহৃদয়ের এই অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষাই বুঝি পিসির চরিত্রের প্রধান চালিকা শক্তি। তাই মা হিসেবে গজার প্রতি অন্ধ বাৎসল্য তাঁকে ব্ল্যাকমেইল-এর মতো হীন কাজেও প্ররোচিত করেছে, যেখানে তিনি স্বার্থপরও বটে!

"টাকাপয়সার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে এইটুকুই বলা যায় গাঁজাখোর, বখাটে ছেলে গজাকে সম্পত্তি দিয়েই পদিপিসির সার্থকতা এবং তৃপ্তি।"

তবু এটাই বাস্তব, এটাই সত্যি, যেখানে বখাটে ফুলবাবু গজার প্রতি অফুরান স্নেহের অমিত ভাণ্ডার পদিপিসির মায়ের মন। তাই মৃত্যুর আগে বর্মিবাক্সের প্রকৃত অবস্থান তাঁর স্মরণে এলে তৃপ্তির হাসিটুকু লেগে থাকে আমৃত্যু।

আসলে, ছোটদের জন্য কোনো অবাস্তব কল্পনাকে তৈরি করেননি লীলা মজুমদার। তাই বাস্তবতার নানা ধরনের ছবি গোটা গল্পটার গা জুড়ে সেঁটে আছে। যেখানে কোনো অলীক অর্থহীন বানানো জগত নয়, বরং বড়োদের জগতের টাকাকড়ি ও অর্থলিপ্সা কিশোর মনকে ছুঁয়েছে বারবার, সে তার নিজের মতো করে বুঝে নিয়েছে বড়োদের প্রবৃত্তির নগ্ন উদ্ভাস। একটু হলেও বিচলিত হয়েছে তাদের অমলিন হৃদয়।

"বড়োদের জগতের অনেকটা জুড়ে আছে টাকাকড়ি। টাকাপয়সার জন্য বড়োরা পারে না হেন কাজ নেই। তাদের কথাবার্তায় ঠিকরে বেরোয় অর্থলিপ্সা, আচার আচরণে লুকোন লোভ ফুটে বেরোয়। .....গুপীর গুপ্তখাতা এবং পদিপিসির বর্মিবাক্সেও আছে সম্পত্তির জন্য বড়োদের দুর্দান্ত লোভের আখ্যান।"

টইটম্বুর মজা আর অনাবিল হাসি-কে একপাশে সরিয়ে রাখলে পদিপিসির বর্মিবাক্স আগাগোড়াই ঠিকরোণ লোভ আর আক্রোশে ঠকানোর একটা গল্প। ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক কাঠামোর এক শৃঙ্খলিত চেহারা যেন। যেখানে সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে পরিবারতন্ত্রের নির্লজ্জ লোলুপতা, নিকট পরিজনদের সঙ্গে প্রতারণার নানা কৌশল, ব্ল্যাকমেইল তদুপরি সম্পর্ক ভাঙাগড়ার এক বিচিত্র বিন্যাস দেখা যায়। সেখানে মজার লেশমাত্র নেই, কেবল গুপ্ত ধনভাণ্ডারের সন্ধানে শিকারী নেকড়ের মতোই সবাই যেন ওঁৎ পেতে বসে থাকে।

"......বড় সাইজের একটা বর্মিবাক্স, লালচে রঙের উপর কালো দিয়ে আঁকা বিকট

এক হিজে এক মাছ প্যাটার্নের ড্রাগন, তার চোখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে, নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, জিভ লক্‌লক্‌ করছে।"

বড়োদের লোভের রেলিংয়ে শিশুর কিশোর কল্পনা ... পদিপিসির বাক্সের এমনই চেহারা। একটা বিকটত্ব, যা ভালো লাগে না ... মানুষের পা... ... বুদ্ধির লালসা যেন জমাট বেঁধে আছে ঐ বাক্সে!

"পাপের ওপর পাপ চেপে পর্বত তৈরি হয়েছে—সব আমি একা উদ্ধার করব।"

পাঁচুমামার এমনই ইচ্ছে, সবটুকুই সে একা আত্মসাৎ করতে মরিয়া।

আসলে বড়োদের বাস্তব জগতের অনেকটাই জুড়ে থাকে সম্পত্তি, টাকাকড়ি, পাওনাগণ্ডার হিসেব নিকেশ। তাদের অর্থলিপ্সু আচার আচরণে লুকোনো থাকে লোভ, জমানো পাপ যেন ঠিকরে বেরোয়। তাই বর্মিবাক্সের কথা শোনা ইস্তক বড়োদের, "চোখ ইজ জ্বলজ্বলিং"। টিকটিকিপড়া গোয়েন্দা, পাঁচুমামা, সেজপিসি, প্রতিটি মানুষই লোভের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত। সবাই সবাইকে সন্দেহের তালিকায় রেখেছে। ট্রেনে ওঠা থেকেই গল্পের কিশোরটি পাঁচুমামার চোখ দিয়ে শত্রুপক্ষকে চিনে নিতে চেয়েছে, যারা কিনা বর্মিবাক্স আত্মসাৎ করতে তৎপর। এরা সবাই পরস্পরের নিকট-আত্মীয়ও বটে। তবু সম্পর্কের রসায়নটা কেমন যেন বদলে যায়। সেজদাদামশাইয়ের চোখ দুটো কেন যেন হিংস্র মনে হয়—

"বুকের ভেতর ধ্বক করে টের পেলাম শত্রু নম্বর ওয়ান।"

দিদিমার আহ্লাদ মুগ্ধ করলেও পাঁচুমামা চিনিয়ে দিল: "শত্রু নেক্সট নম্বর ওয়ান স্পাই।"

স্নেহশীলা দিদিমাকে পাঁচুমামার স্পাই বলার কারণ কিছুতেই বুঝে ওঠা যায় না। বই পড়ে বা গল্প শুনে কিশোর মনে স্পাইয়ের যথার্থ যে আদল তৈরি হয়ে আছে সেই ছাঁদে কিছুতেই দিদিমাকে সে মেলাতে পারে না। এই পারা না-পারা, বিশ্বাস অবিশ্বাসের টানাপোড়েনে তার মন বিভ্রান্ত! দ্বিধাগ্রস্ত! মেলাতে পারে না কিছুতেই! একটু একটু করে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার পঙ্কিল আবর্জনার সবুজ মন ক্লিষ্ট হতে থাকে। অচিরেই সে বুঝে নেয় কার্যসিদ্ধির জন্য ঘুস দেওয়া, এও এক উপায়!

"বুঝলাম ঘুষ দিয়ে চাকর সম্প্রদায়কে হাত করছে! কী ভীষণ!"

ধীরে ধীরে জাগতিক লোভের অন্ধকার গল্পের অলিতে-গলিতে পাক খেতে থাকে। ক্রমেই চেনা মুখগুলো যেন ফিকে হয়ে গিয়ে অচেনা হয়ে ওঠে। বর্মিবাক্স হস্তগত করতে সেজোদাদামশাই নগদ দুশো টাকা দিয়ে গোয়েন্দা লাগিয়েছেন, রাতবিরেতে চুক্তিপত্রে সইসাবুদ করতেও উঠেপড়ে লেগেছেন। ওদিকে সেজপিসিও জুটেছেন তাঁর শ্রীধন কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নিতে। পাঁচুমামার ঐকান্তিক ইচ্ছে বর্মিবাক্স সে একাই আত্মসাৎ করবে। এমনকি গোয়েন্দা ভদ্রলোকও বর্মিবাক্সের তিন ভাগের একভাগ দাবি করে বসে। একসময় বর্মিবাক্সের অধিকার নিয়ে পারিবারিক কোন্দল প্রকট হয়ে ওঠে।

"—পদিপিসির বাক্সর জন্যে তোরাও খোঁজখোঁজ করে বেড়াচ্ছিস! অথচ বাক্সতে

আর কারো অধিকার নেই। ওটা ইঁদুর, আমি পালো।' সেকথাগামশাই তোলা বলেন, 'তুই পাবি মানে? তোর জন্মে সেটি যাবে বল। আমি অহিন পাশ করেছি, য জানিস? কেউ যদি পায় তো আমি পাব।' জানিস দুলো টাকা খরচ করে ঘটিগুলি লাগিয়েছি। ও রঙ্গ আমি কেন করবই।' এইবার দরজার কাছ থেকে একটা গলা কঠিন শব্দ শোনা গেল। দেখলাম টিমাতে হয়ালাইক সেখানে কালো অবনীর পাব কেন নিতে দাঁড়িয়ে নিতি চাচ্ছেন। বিত্তিটা এবার বের করে বললেন, 'দলে থাকে কে তিন ভাগের একভাগ আমার। যদি বাজ পান আমার অদ্ভুত বুদ্ধির পাইয়েছি পাবেন'।"

বর্ণিবাক্সের উদ্ভাবিকার নিয়ে বাড়ির লোকজনদের মতভূমিটি ও কার্যকলাপ একটা সামগ্রিক মজাদার পরিমণ্ডল তৈরি করেছেও, আড়ালে পরিবারের সদস্যদের জেদী চেহারাটিও বড়ো নয়, দেখতো। চোখ এড়ায় না। ফলস্বরূপ, বাড়ির আত্মশক্তা অনাহতেই একটু হলেও কিশোর মনকে হতোচিত করে তোলী যত উঠেছে, যখন পরিলিপি তাকে নির্দেশ দেন:

"ভালো করে খুঁজে দেখ। পেলে তুই-ই নিস। পাঁচটা একটি ইঁজিয়াং, জেলালের কণ্ঠ তোর ঠিক করতে পারে না, তুই-ই নিস। বাক্সের মধ্যে লাল টুপির খানে খু আছে, তোর মাকে দিস। আর দেখ, ওই বাটা চিমড়েটাকে আর ওই খুড়োটাকে এককোড় দক্ষিণ অক বেকা বানিয়ে নিস।"

এরপর, "আট-দশটা মালা আর নীল সবুজ পাথর বসানো আংটি, হার, বালা ও একজোড়া ঝুমকো লাল টুনি বসানো কানের দুল। বুঝলাম মনে পরিলিপি এটাও আমার মাকে দিতে বলেছিলেন। তাই দেটা তখুনি পকেটে পুরলাম।"

বাবা এমনভাবে নির্দেশ আর সংযোগে বাক্স হাতে পেয়ে কিশোরের অন্তরও কিছু তার অবচেতন মনের এক গূঢ় জটিল এবারই প্রকাশ। পাঁচুমামার থমথমতা আর বাক্স পেয়ে "তুই-ই নিস" (দু-বার বলেছেন) তার গোপন জেদেরই বহিঃপ্রকাশ, য অন্যভাবে উঠে আসে বাক্সের সিঁড়ি বেয়ে। বাক্সের কেউ কিছু জানার আগেই সেই দু কমানো দুল-জোড়া সে তুলে পকেটে পুরে দেয় তার মাকে দেবে বলে। পরিলিপির নির্দেশ! অতএব সমর্পণে সে এ ভাবপ্রত্যয় গোপন করে যায় অন্যদের থেকে। তেমনি নিমিয় বাক্স উদ্ধারের পর তার মেয়েকে দেবার জন্য একজোড়া বালা নাতির হাতে তুলে দিতেও, সে চুপ করে থাকে। বাক্স উদ্ধারের পুরস্কার হিসেবে দিদিমা আর পদি পাঁঠা বসানো আংটি দিয়েছেন। তবু এক জোড়া টুনি বসানো কানের দুল সে কখনই প্রকাশ্যে আনে না। সত্য গোপনের মতো অনৈতিক আচরণের অগ্রীমের হাত পড়ে অবশেষে এক কিশোর। আসলে সংসারে বড়োদের লাগামছাড়া দুর্নীতির জেরের আবিলতা উন্মোচিত স্ফুরিত করে চলে যাপনের যাবতীয় ছিদ্রেরদিকেও, আর সেই যাঁদের শিশুর অভিজ্ঞতা কিশোর নিয়ে নিতে চায় জীবনচর্চার বাস্তব পাঠ। ধর্ম কৈশোরে এক এক করে ঝুকে যায় কলায়, অনৈতিকতা, স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা

ঘরো ইন আক্রোশ, অহিতেই তারা হয়ে ওঠে পাঁচুমামা, সেজদাদু, পেরিপিসির মতো এক একজন পরিণত-মনস্ক সামাজিক মানুষ। লীলা মজুমদার সব সময়ই চাইতেন অহিতা ঘ্যামতাদের হয়ে ইন্দ্র গ্রাসর অন্তরঙ্গ বাস্তবের একটা পুরো বাঁক ধরান তুলে ধরে নিতে। তাই কিশোর পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চাইতেন তাঁর গল্প-উপন্যাসে আনা চরিত্রগুলোকে।

"লীলা মজুমদারের গল্পের চরিত্ররা অনন্যক। তৈরিদের জন্য নীরা লিখতেন তাঁদের কাছেও হাতে এত রকম চরিত্র অতুলনী। এত রকম উদ্ভাবন করতে দেখা নেই। মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সহজ বাস্তবিক। মানুষের চরিত্রের নানা ধরনের নানাবকম কাজ তাদের। সবাই যে খুব ভালো বা খুব খারাপ তা নেহাত নয়, ভালোয় মন্দয় মেশানো। সতিদ্যাগের মানব যেমন হয়। এ কারণেই তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। বিশ্বাস করানোটাই লেখকের আসল শক্তি, নিজের যরে কৈশোর্থের সাহিত্য। বোধ হয় বড়োদের লেখার ক্ষেত্রেও কথাটা সত্যি।"

সাহিত্য সৃষ্টির এই কৌশল ছিল সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের জনাস্থানের এক মজাদার প্রতিভা। নিরলসভাবে জীবনের দেখা ও শোনা-র গল্পে মধ্যবিত্ত নিয়ে বাস্তবিকটো নিরোজেন তাঁর সাহিত্যের আনন্দ জগৎ, যেখানে কিশোর থেকে বাচ্চা-বুড়োদের সমান প্রবেশাধিকার। 'পদিপিসির বর্মিবাক্স' সেই সাহিত্যভাবনার এক যথার্থ উৎসার। 'বর্মিবাক্স' পাঠ করা যেমন মনের তুষ্টিকর, প্রাণের আনন্দদায়ক, তেমনই তাকে বিশ্লেষণ করা অতোধিক দুরূহ, কারণ মননের ভালোলাগার আবেশ উন্মুক্তিত করে ফেলে, লেখা আস্বাদনের মগ্নতা হারায়। তাই কিছু বিচ্ছিন্ন ভাবনার নিরব ব্যাখ্যা এই লেখা, যা লেখিকা লীলা মজুমদার ও তাঁর 'পদিপিসির বর্মিবাক্স'র প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং আমার ছেলে-খেলা কিশোরবেলাকে আর একবার ফিরে দেখা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। পদিপিসির বর্মিবাক্স। লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র, প্রথম খণ্ড। (সম্পা.) সোনা মুখোপাধ্যায়। লালমাটি, প্রথম প্রকাশ ২০০৮।

২। তেরহি, আলোকপাত লীলা মজুমদার। (সম্পা.) সন্দীপ ভট্টাচার্য। প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৬।

৩। অন্য অন্য লীলা মজুমদার। (সম্পা.) প্রসাদরঞ্জন রায়। আনুইল, কলকাতা, ২০১১।

পদিপিসীর বর্মিবাক্স

লীলা মজুমদার

সংক্ষিপ্ত সারাংশ :

বাংলা কথাসাহিত্যে এক অনন্য প্রতিভার লেখিকা হলেন লীলা মজুমদার। তাঁর এক অসামান্য গল্প হল—'পদিপিসির বর্মিবাক্স'। মূলত ছোটোদের গল্প হলেও আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের মন হরণ করেছে এই গল্পটি। এখানে পদিপিসির তার নিমাই খুড়োর কাছ থেকে গয়নার বাক্স পায় এবং বাড়ি এসে ভুলে যায় বাক্সটি কী করেছে। সেই বাক্স আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। একশ বছর পর পদিপিসির বংশধর পাঁচুমামা ও তার ভাগ্নে বাক্স খোঁজার মনোনিবেশ করবে এইভাবে গল্পের শুরু।

কথক মামাবাড়ি রওনা দিয়েছে সাথে আছে রোগা প্যাকাটির মত চেহারার পাঁচুমামা। পাঁচুমামাকে টেনে তুলে ট্রেনে তুলেছে কথক। খাবারওয়ালাকে ডাকিয়ে লুচি, আলুর দম, কপির সিঙ্গারা, খাজা আর রসগোল্লা খাইয়েছে। পাঁচুমামা ছোটবেলায় ভুল করে একবার বাদশাহী জোলাপ খেয়ে নিয়েছিল, সেই থেকে শরীরটা একদম খারাপ। কিন্তু বুকে সিংহের মতো তেজ আছে। তাই সে পদিপিসির বর্মিবাক্স খোঁজার ব্যাপারে হাত দিয়েছে। পাঁচুমামা কথককে জানায় — একশো বছর পরে বর্মিবাক্স সেই-ই আবিষ্কার করবে। সেই বাক্সের মধ্যে পান্না আছে মোরগের ডিমের মতো, চুনী আছে এক একটা পাররারা ডিমের মতো এবং মুক্তো আছে হাঁসের ডিমের মতো। মুঠোমুঠো হীরা আছে গোছা গোছা মোহর আছে আরো কত কী আছে তার কোনো খবর নেই। এইসবকথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল আর এক চিনড়ে ভদ্রলোক। পাঁচুমামা জানায় পদিপিসি বেঁটেখাটো বিধবা মানুষ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, আর মনে জিলিপির প্যাঁচ। সিংহের মতো তেজও ছিল। তিনি ভালো রাঁধুনি ছিলেন। একবার ঘাসের চচ্চড়ি রান্না করে বড়োলাট সাহেবকে 'থ' করে দিয়েছিলেন। মাঘী পূর্ণিমার রাত্রে গোরুর গাড়ি করে বালাপোশ গায়ে দিয়ে বত্রিশ বিঘার শালবনের মধ্য দিয়ে নিমাইখুড়োর বাড়ি যান। রাস্তায় তাদের ডাকাতরা ঘেরাও করে এবং পরে পদিপিসি জানতে পারে নিমাইখুড়ো ডাকাত দলের সর্দার। এই কথাটা সবাইকে জানিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে অনেক মনি-মানিক্য-রত্ন বোঝাই করা এক বর্মিবাক্স আদায় করে। এবং বাড়ি ফিরে এসে দেখে বগলে যে কাঠের বাক্স ছিল তার বদলে আছে পানের ডিবে। প্রচুর খোঁজাখুঁজির পর ও ঐ বাক্স পাওয়া যায় নি।

পদিপিসির এক ছেলে ছিল। তার নাম গজা। কালো রোগা ডিগডিগে, এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া তেল চুপচুপে টেরি বাগানো। দিনরাত কেবল পান খায় আর তামাক টানে। সেই গজা একদিন হঠাৎ করে বড়োলোক হয়ে যায়। সবাই কে পাঁঠার মাংস খাওয়ায়। ঘোড়ার গাড়ি কিনে ফেলল এবং হীরের আংটিও কিনল। কলকাতায় বাড়িও কিনেছে।

একটা সময় কথকরা তাদের মামার বাড়ির স্টেশনে নামল। ঘনশ্যাম এসেছে তাদের আনতে। মামার বাড়ি গিয়ে কথক তার দিদিমার অনেক স্নেহ আদর পেল তার সাথে ভরপেট খাওয়া। মামা বাড়িতে এসে কথক পাঁচুমামাকে দেখতে পেল না। কথকের দিদিমা

Scanned with CamScanner

সেজ দাদামশাইয়ের সাথে কথকের পরিচয় করিয়ে দিল। রাত্রিরে শোওয়ার সময় দিদিমা কথককে পদিপিসির গল্প শোনায়।

পরদিন সকালে কথক দেখতে পায় ট্রেনের সেই চিমড়ে ভদ্রলোক বাইনোকুলার চোখে দিয়ে কথকের মামার বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। এই চিমড়ে ভদ্রলোককে কথকের সেজ দাদামশাই ২০০ টাকা দেয় বর্মিবাক্স খোঁজার জন্য। অবশেষে কথক মামার বাড়ির ছাদে শ্রী গজার একমাত্র আশ্রয় থেকে ছাগলের চোখ জ্বলজ্বল করা বর্মিবাক্স আবিস্কার করেন। বর্মিবাক্সটি কথক তার দিদিমাকে দেয়। তার দিদিমা সবাইকে সমস্ত গহনা বাঁটোয়ারা করে দেয়। পদিপিসির বোন খেঁদি কে সোনার হার দেয়। সেজ দাদামশাইকে হীরের আংটি দেয়। নিজের জন্য বালাজোড়া রাখে কথকের মাকে দেওয়ার জন্য। আর কথককে দেয় পান্নার আংটি। এইভাবে কথক পদিপিসীর বর্মিবাক্স আবিস্কার করে।

Scanned with CamScanner

লীলা মজুমদার

১৯০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় লীলা মজুমদারের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম প্রমদারঞ্জন রায় এবং মাতার নাম সুরমাদেবী। তাঁর শৈশবকাল শিলং-এ অতিবাহিত হয়। শিলং-এর কনভেন্ট স্কুলে তাঁর পড়াশুনোর প্রাথমিক পর্ব শুরু হয়। অতঃপর তাঁর পিতা চাকরিসূত্রে ১৯১৯ সালে কলকাতায় বদলি হয়ে আসেন। সেই সময় তিনি কলকাতার 'ডায়োসেশন' স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখানেই তিনি তাঁর পরবর্তী পড়াশুনো সম্পূর্ণ করেন। ১৯২৪ সালে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দ্বাদশ স্থান অধিকার করেন। এমনকি ১৯২৬ সালে আই. এ. পরীক্ষাতেও দ্বিতীয় স্থানে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ সালে ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৩০ সালে ইংরাজিতে এম. এ. পরীক্ষায় যুগ্মভাবে প্রথম হন। অতঃপর তিনি ১৯৩১ সালে দার্জিলিং-এ এবং ১৯৩২ সালে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেন। ১৯৩২ সালে ডাঃ সুধীরকুমার মজুমদারের সহিত তাঁর বিবাহ হয়।

লীলা মজুমদার খুব অল্প বয়স থেকে গল্প লেখা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে 'সন্দেশ' পত্রিকায় তিনি বেশকিছু ছোটগল্প লেখেন। এমনকি নিজের গল্পের ছবি তিনি নিজেই আঁকতেন। ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত মৌচাক, রংমশাল ও রামধনু পত্রিকায় প্রচুর গল্প ধারাবাহিকভাবে লেখেন। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত তিনি আকাশবাণী-র সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বভার বহন করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি অকাদেমি পুরস্কার পান এবং ১৯৬৮ সালে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ছোটবড় সকলের জন্যই প্রচুর গল্প-উপন্যাস লেখেন। ছোটদের জন্য তাঁর লেখাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—পদিপিসীর বর্মিবাক্স, হলদে পাখির পালক, খেরোর খাতা, দিন-দুপুরে, বদ্যিনাথের বড়ি, নেপোর বই ইত্যাদি, ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner